সম্পাদক সমীপেষু:

দূষিত চূর্ণী

নদিয়া জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী চূর্ণী। মূলত রানাঘাট মহকুমার লাইফ লাইন হিসাবে পরিচিত চূর্ণী আজ ভেন্টিলেশন-এ। নদীটি অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার পদ্মা নদী থেকে উৎপন্ন মাথাভাঙা নদীর একটি শাখা। মাথাভাঙা নদী ভারতে প্রবেশ করে নদিয়া জেলার মাজদিয়ার পাবাখালি থেকে দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে একটি শাখা চূর্ণী নামে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত, অন্য শাখাটি ইছামতী নামে দক্ষিণে বাহিত। চূর্ণী নদী মাজদিয়া, শিবনিবাস, হাঁসখালি, বীরনগর, আড়ংঘাটা, রানাঘাট হয়ে প্রবাহিত হয়ে পায়রাডাঙার কাছে ভাগীরথী নদীতে মিশেছে।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও চূর্ণী ছিল পরিবহণ বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ। নদীতে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছও ছিল, বহু মানুষ তাঁদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতেন নদী পরিবহণ ও মাছ ধরে। পাওয়া যেত সুস্বাদু কালবাউশ মাছ এবং গলদা, সরপুঁটি; জলে ঘুরে বেড়াত সুদি-কচ্ছপ, কালো ডলফিন (যা গাঙ্গেয় শুশুক নামে পরিচিত)। নদীর দু'পারের গাছগুলোতে বিভিন্ন প্রজাতির পাখিও দেখা যেত। এখন আর কিছু পাওয়া যায় না। দীর্ঘ কাল চূর্ণীর উপর অত্যাচার চলতে থাকায় নদীটি বর্তমানে বহু সমস্যায় জর্জরিত। পরিবেশকর্মীরা বলছেন, পুরো জীববৈচিত্রই উধাও হয়ে গিয়েছে নদী থেকে। নদী পারে লোক বসিয়ে মোটা টাকা উপার্জন করতে গিয়ে অনেক কাল আগেই নদী পার দখল হয়ে আছে। বাসিন্দাদের মল, মূত্র-সহ যাবতীয় আবর্জনা, খাটালের দূষিত পদার্থ, কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য— সবই নদীতে পড়ছে। সঙ্গে যুক্ত হয় বছরে তিন-চার বার বাংলাদেশের দর্শনার চিনিকলের ছাড়া দূষিত কালো জল। ফলে চূর্ণীর জল এতটাই দূষিত ও বিষাক্ত যে, মাঝে মধ্যেই নদীর মাছ মরে ভেসে ওঠে, নদীতে স্নান করার ফলে অনেকেরই চর্মরোগ দেখা দিচ্ছে।

এ তো গেল সরাসরি নদী-দূষণ, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক ব্যক্তির ছত্রছায়ায় থাকা কতিপয় মৎস্যজীবীদের দ্বারা নদীবক্ষে অবৈধ ভাবে বাঁধাল নির্মাণ করে মাছ ধরা। এর ফলে এক দিকে যেমন নদীর প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয়, পাশাপাশি বাঁধালের জায়গাতেই মাছের আনাগোনা হলে নদীর অন্যত্র মাছের বিচরণ সে ভাবে থাকে না। ফলে অন্য মৎস্যজীবীরা, যাঁরা বাঁধাল দিতে পারেন না, সারা দিন মাছ ধরার চেষ্টা করেও খুব সামান্য মাছ পেয়েই তাঁদের চলতে হয়। এ ছাড়া মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নদীকে আরও ভেন্টিলেশনে পাঠিয়ে দিয়েছে। ইটভাটার জন্য যথেচ্ছ ভাবে যেখান-সেখান থেকে নদীর মাটি কেটে নেওয়ার ফলে নদীর স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া কালীনারায়ণপুরে একই স্থানে চূর্ণীর উপর রেলব্রিজ ও ফুটব্রিজের অবস্থান নদীকে এক ফালি খালে পরিণত করেছে।

নদীর এই রুগ্ণ অবস্থা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে মহকুমাশাসক, জেলাশাসক, রাজ্যের সেচ দফতর, এমনকি কেন্দ্রের জলসম্পদ দফতরে পরিবেশকর্মীরা বহু চিঠি দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এসে নদীর বেহাল অবস্থা দেখানোও হয়েছে। কিন্তু রাজা আসে, রাজা চলে যায়। আর নদী একবুক পলি নিয়ে হতাশ নয়নে চাতকের মতো চেয়ে থাকে, কবে সে নাব্যতা ফিরে পাবে।

WBCS Bengali Compulsory Paper.com

সম্পাদক সমীপেষু: কে করবে বৃক্ষরোপণ

‘আসছে বছর আবার, হবে তো?’ (২৫-১২) শীর্ষক প্রবন্ধে ইন্দ্রজিৎ রায় জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রশ্ন তুলেছেন। সমস্ত বিশ্ববাসীরও একই প্রশ্ন— কেন সবুজ ধ্বংস হচ্ছে, যেখানে আইনে স্পষ্ট নির্দেশ আছে? বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন ঘটা করে পালিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে পাঁচতারা হোটেলে বসে। অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে এই প্রকল্পে। এ দিকে ধনী দেশগুলির অন্যতম আমেরিকা নিজের চুক্তি নিজেই ভাঙছে। জাতীয় সড়কগুলো দু’লেনের থেকে আট-দশ লেনের হচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে চওড়া রাস্তা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তাই বলে বড় বড় গাছ কেটে মাঝখানে ফুলের গাছ লাগালে কি পরিবেশ রক্ষা করা যাবে? বড় বড় শহরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে সমস্ত গাছের বিলুপ্তি ঘটেছে, সেই স্থানে কি নতুন গাছ রোপণ করেছে কর্তৃপক্ষ?

সবাই জানি আমাদের ঋতু ছ’টা। কিন্তু আগামী প্রজন্ম শরৎ, হেমন্ত, বসন্তকে আলাদা করে বুঝতে পারবে না। এখন অনেক সময়ই অকাল বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। মফস্সলে প্রকৃতির নিধন নির্বিচারে হচ্ছে। রাস্তার ধারে পূর্ণবয়স্ক গাছগুলো কেটে নিয়ে আর সেখানে নতুন কোনও গাছ লাগানো হচ্ছে না। এই সব কথা কি রাষ্ট্রনায়কদের কানে ঢুকবে? না কি ঢুকলেও তা কর্পোরেটের দাপটে ঢাকা পড়ে যাবে?

WBCS Bengali Compulsory Paper.com

সম্পাদক সমীপেষু: রাজভাষা হিন্দি?

অগণতান্ত্রিক’ (সম্পাদক সমীপেষু, ২৭-১২) চিঠিতে পত্রলেখক মিহির কানুনগো “বঙ্গে চাকুরি করিতে হইলে বাংলা ভাষাটি শিখিয়া লইতে হইবে” এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন, “ভারতে হিন্দি রাজভাষা হিসাবে সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃত।” এই তথ্য উনি কোথায় পেলেন? ভারতে কোনও রাজভাষা নেই, ‘সরকারি ভাষা আইন’ অনুসারে ২২টি ভাষা সংবিধানের অষ্টম তফসিলভুক্ত এবং হিন্দি ও বাংলা উভয়ই সেই ভাষাগুলির অন্যতম। সাংবিধানিক ভাবে ২২টি ভাষাই সমান মর্যাদা পায়, হিন্দির আলাদা কোনও মর্যাদা নেই।

পত্রলেখক আরও বলেছেন, কোনও অবাঙালি কর্মীর বাংলা না জানার জন্য সরকারি কাজে বিঘ্নের কথা তিনি দেখেননি বা শোনেননি। তিনি না শুনতে পারেন, কিন্তু হিন্দিতে তেমন সড়গড় না হওয়ায় আমার পরিচিত বহু মানুষকেই ব্যাঙ্ক বা সরকারি দফতরে সমস্যায় পড়তে দেখেছি। কিছু মাস আগেই এক বাঙালি পরিচালক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে, এক অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার অবাঙালি কর্মী তাঁকে হিন্দি না জানায় অপমান করে বলেছেন, ভারতে থাকতে হলে হিন্দি জানতেই হবে, নচেৎ বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। আমি নিজেই কিছু দিন আগে ইউটিউবে এক ভিডিয়োতে বাংলায় মন্তব্য করায় এক অবাঙালির কাছে ঠিক একই কথা শুনেছি। ‘হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থানের’ একাধিপত্যকামী প্রচারের চোটে বাংলাকে কেবল বাংলাদেশের ভাষা হিসাবে দেখার এক মারাত্মক প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে।

পত্রলেখক বাংলায় চাকরি করার জন্য বাংলা শেখার সিদ্ধান্তকে অগণতান্ত্রিক বলেছেন। কিন্তু তিনি এটা ভাবলেন না, এক জন হিন্দিভাষী যখন বাংলায় আসেন, বাংলার মানুষ তাঁর সমস্যার কথা ভেবে হিন্দিতেই কথা বলেন, অন্তত চেষ্টা করেন। কিন্তু এক জন বাঙালি ভিনরাজ্যে গেলে সেটা দেখা যায় না। হিন্দি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বলে সংখ্যালঘু বাঙালিকে সেটা শিখতেই হবে, আর সংখ্যালঘুর ভাষা বলে হিন্দিভাষীরা বাংলা শিখবেন না, এটা গণতান্ত্রিক?

সম্পাদক সমীপেষু: জঞ্জালে জরিমানা

নতুন পুরসভার কাছে আমার শুধু একটাই প্রত্যাশা— স্বচ্ছ কলকাতা। স্বচ্ছ ভারতের জন্যে ১৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, নির্মল বাংলার জন্যে ২৬৬১ কোটি টাকা। কিন্তু স্বচ্ছ কলকাতার জন্যে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তা আমার জানা নেই। এখানে যে কোনও পোস্টার লাগানোর পরে তা বছরের পর বছর লাগানোই থাকে। পুরসভার কোনও ব্যবস্থা নেই জরিমানা করার। কলকাতায় সব রাজনৈতিক পোস্টার সরাতে পারলে কলকাতা অন্তত ৭০% পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর রাস্তার ধারে ধারে দুটো করে নীল-সবুজ ডাস্টবিন রাখতে পারলে ভাল হয়। যদি আবার রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা চালু হয় তবে ভাল হয়। আমরা বাড়িতে ‘কনসিলড ওয়্যারিং’ করি, কিন্তু রাস্তার কেবল-ইলেকট্রিক আর টেলিফোন তারের জঞ্জাল ঢাকা দেওয়ার কথা কেন চিন্তা করি না? আসলে স্বচ্ছ কলকাতা আমাদের ভাবনায় নেই। বাঙালির সিভিক সেন্স-এর উদাহরণ হল যাদবপুরের আন্ডারপাস, যা জঙ্গলে পরিণত।

কলকাতা পরিষ্কার রাখতে গেলে কিছু কড়া সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। সিঙ্গাপুরের মতো জরিমানা চালু করতেই হবে। সিঙ্গাপুরে যেমন রাস্তায় চুইংগাম খাওয়া বারণ, তেমনই এখানে গুটখা বা ওই জাতীয় জিনিস খাওয়া বন্ধ করতে হবে। আমরা জঞ্জালনগরী থেকে তিলোত্তমা করতে পারব কলকাতাকে, যদি নতুন পুরসভা পথ দেখায়।

WBCS Bengali Compulsory Paper.com

সম্পাদক সমীপেষু: লুণ্ঠিত সম্পদ

ভূগর্ভস্থ জলের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। কিছু স্বার্থান্বেষী, লোভী মানুষের জন্য আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়তে পারে। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া ও দেগঙ্গা ব্লকের অন্তর্গত বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হাইব্রিড প্রজাতির মাগুর মাছ চাষের জন্য তৈরি হয়েছে হ্যাচারি। সেগুলোতে পরিস্রুত জলের প্রয়োজন মেটাতে লক্ষ লক্ষ লিটার জল উত্তোলন করা হচ্ছে। আর সবটাই হচ্ছে প্রশাসনের নাকের ডগায়। তবুও সবাই নির্বিকার। এই এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ, যার পুরোটাই হয় ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভর করে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, একটি হ্যাচারিতে জল সরবরাহের জন্য বানানো ১০০০ ঘনফুটের একটি ট্যাঙ্ক থেকে ২৪×৭ জল সরবরাহের জন্য প্রতি দিন কমপক্ষে ৩ লক্ষ লিটার জলের প্রয়োজন। আর এই বিপুল জলের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিটি হ্যাচারিতে কমপক্ষে ৩ অশ্বশক্তি সম্পন্ন একজোড়া বৈদ্যুতিক পাম্প অনবরত কাজ করে চলেছে। কোথাও কোথাও সংখ্যাটা আরও বেশি।

বাগজোলা ও কলসুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অন্তত এমন শতাধিক হ্যাচারি আছে, যেগুলো থেকে দৈনিক ৩০০ লক্ষ লিটারেরও অধিক জল তোলা হচ্ছে শুধুমাত্র মাগুর চাষের জন্য। এই কাজ চলছে বছরের পর বছর ধরে। ফলে দ্রুত নেমে যাচ্ছে ভৌমজলের স্তর ও তার গুণগত মান। ইতিমধ্যেই আশপাশের গ্রামগুলিতে পানীয় জলের অভাব দেখা দিচ্ছে। পঞ্চায়েত ও পুরসভা স্তরে ভূগর্ভস্থ পানীয় জল উত্তোলনের জন্য নির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা সত্ত্বেও এর পুরোটাই হচ্ছে বেআইনি ভাবে। প্রশাসনিক লাইসেন্স, অনুমতি, নজরদারি ছাড়াই।

এ ভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে জলসঙ্কট তো দেখা দেবেই, সঙ্গে দেখা দিতে পারে পার্শ্ববর্তী দেগঙ্গা ব্লকের মতো জলে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইডের বিষক্রিয়া। যার ভয়াবহ পরিণাম চোকাতে হতে পারে সবাইকেই।

WBCS Bengali Compulsory Paper.com

সম্পাদক সমীপেষু: আন্তর্জালে আটকে

ইন্টারনেট বা আন্তর্জাল আজকের শিশুদের মনে যে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে, সে বিষয়ে সময়োপযোগী আলোকপাত করা হয়েছে 'অন্তর-জাল' (২৭-১২) সম্পাদকীয়তে। শিশুরা আজ ইন্টারনেটে এতটাই জড়িয়ে পড়েছে যে, তাদের আচার-আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, এর জন্য দায়ী বর্তমান সমাজব্যবস্থা এবং পরিস্থিতি। বাবা-মায়ের ব্যস্ত জীবনে সময় নেই ছেলেমেয়েদের দিকে তাকানোর কিংবা নজরদারি করার। স্কুল বন্ধ থাকায় গৃহবন্দি শৈশব বিশ্ব-প্রকৃতির সংস্পর্শে আসতে পারেনি। পা পড়েনি খেলার মাঠে কিংবা পার্কে। দিনের পর দিন বাড়িতে আবদ্ধ থেকে একঘেয়ে জীবনে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে। এর থেকে মুক্তি পেতে ক্লাসের ফাঁকে কিংবা বাড়িতে বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে ইন্টারনেট জগতে ঢুকে পড়েছে শিশুরা।

ইউটিউব কিংবা গুগলের পর্দায় ভেসে ওঠা একের পর এক লোভনীয় ছবির দৃশ্যপট শিশুমনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক অলীক স্বপ্নের জগতে, বাস্তবের সঙ্গে যার মিল নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা তারা বুঁদ হয়ে আছে। পড়াশোনায় আগ্রহ কমে আসছে। হ্রাস পাচ্ছে কল্পনাশক্তি, সৃষ্টিশীলতা। আসক্ত হয়ে পড়ছে বিভিন্ন অনলাইন খেলায়। আর বেশির ভাগ ভিডিয়ো গেমই 'ভায়োলেন্স'-এ ভরা, যা শিশুদের মনকে বিষাক্ত করছে। প্রভাব পড়ছে তাদের আচার-আচরণে প্রতিনিয়ত। বাবা-মায়েরা কি আদৌ এ ব্যাপারে সচেতন? ট্রেন, বাস, অটোতে দেখি, বাবা-মায়ের পাশে বসে তাদের সন্তানেরা দিব্যি অনলাইনে গেম খেলে যাচ্ছে। যে সব শিশু এখনও ঠিকমতো কলম ধরে লিখতে শেখেনি, তারা আজ ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব সার্চ করে পছন্দের বিষয় খুঁজে নিতে শিখে গিয়েছে। পাশাপাশি আরও এক গভীর আশঙ্কার বিষয় রয়েছে। একটি পরিসংখ্যানে প্রকাশ, ২০১৭ থেকে ২০২০-র মধ্যে বিশ্বে ২৪ লক্ষ শিশুর যৌন হেনস্থার মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে শিশু পাচার, মানব পাচার, যৌন হেনস্থার বেশির ভাগ ঘটনাই রমরমিয়ে চলছে অনলাইনে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্ব জুড়ে।

তাই, শিশুদের আন্তর্জালে জড়িয়ে পড়া থেকে দূরে রাখতে বাবা-মায়েদের শিশুদের মোবাইল ব্যবহারের সময় বেঁধে দিতে হবে। অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে ছেলেমেয়েরা ইন্টারনেট-যুক্ত মোবাইল ফোনের যেন অপব্যবহার না করে। স্কুলে স্কুলে 'ডিজিটাল লিটারেসি' ক্যাম্প করে ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সরকারি ভাবেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ ব্যাপারে জনতাকে সচেতন করা দরকার। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাই, শিশুদের মনের বিকলন ঘটলে আমাদের এই সমাজও বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বে। WBCS Bengali Compulsory Paper.com

সীমাহীন দারিদ্র

‘সব অধিকারে চেপেছে শর্ত’ প্রতিবেদনটি এক হৃদয়স্পর্শী বাস্তব চিত্র। করোনাকালে এক দিকে যখন শাসক-ঘনিষ্ঠ কর্পোরেট সংস্থার পুঁজি বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে, তখন সীমাহীন দারিদ্রের মুখোমুখি দেশের এক বড় অংশের মানুষ। একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ক্ষুধার নিরিখে ভারতের স্থান ১১৭টা দেশের মধ্যে ১০২। সব প্রতিবেশী দেশগুলির থেকে পিছিয়ে। সারা বিশ্বে আজ ৮ কোটি মানুষ ঘুমোতে যান খালি পেটে। অপুষ্টির প্রকোপ বেশি দেখা যাচ্ছে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবরের মধ্যে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মারা গিয়েছে ৮০ জন শিশু। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ও শিশুদের স্কুলের মিড-ডে মিল থেকে ডিম বাদ হয়ে গিয়েছিল প্রায় পাঁচ মাস ধরে। এর ফলে রাজ্য সরকারের ১১০০০ কোটি টাকার সাশ্রয় হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু গর্ভবতী মেয়েদের যখন পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি, ঠিক তখনই অপুষ্টির দিকে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই পুষ্টি না পেয়ে জন্ম নিয়েছে কম ওজনের, অসুস্থ সব শিশু। পৃথিবীর আলো তারা আর বেশি দিন দেখতে পেল না।

অতিমারির সময়ে প্রান্তিক মানুষগুলোর সন্তানদের শিক্ষায় নেমে এল এক চরম বিপর্যয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে ‘লার্নিং টুগেদার’ সংস্থার ছত্রতলে ৭০০৩ জন প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও ৩৬৯টি হতদরিদ্র পরিবারের উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষা বলছে যে, প্রায় ২৮ শতাংশ শিশু লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তাদের হয়তো কোনও দিন আর বিদ্যালয়মুখী করা যাবে না। ইটভাটা থেকে চটকল, প্রতি ক্ষেত্রেই চাহিদা কমে যাওয়ায় উৎপাদন কম। তাই হয় মজুরের সংখ্যা কমে গিয়েছে, নয় কমেছে মজুরি। বাঘের আক্রমণে মৃত্যু বাড়ছে, তবু ভয় অগ্রাহ্য করে সুন্দরবনের মানুষ জঙ্গলের ‘কোর এরিয়া’য় বাগদা, কাঁকড়া ধরতে যাচ্ছেন। ধনেখালির তাঁতিদের মাথায় হাত, কারণ তাঁদের উৎপাদনের বেশিটাই কিনত তন্তুজ। সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে আজ তন্তুজের বিক্রিবাটা একেবারে ভাটিমুখে। এই সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ কী? WBCS Bengali Compulsory Paper.com

বিপন্ন বাঘ

সাম্প্রতিক কালে সুন্দরবন এবং তার আশেপাশের এলাকায় প্রায়ই লোকালয়ে বাঘের উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে। বেশ কিছু নেপথ্য কারণ এর জন্য দায়ী। জল-জঙ্গল-জনবসতি এই নিয়েই সুন্দরবন এবং সেই জঙ্গল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জন্য বিখ্যাত। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন)-এর বিচারে এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বিপন্ন প্রজাতিভুক্ত প্রাণী।

সুন্দরবনের মানুষের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম মাধ্যম হল ঘন জঙ্গলে শিকার ধরা, মধু সংগ্রহ ইত্যাদি। কাজেই তাদের জঙ্গলে যেতেই হবে, যা কিনা বাঘের এলাকা। আর ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী, এই পৃথিবীতে খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত হওয়ার ফলে প্রত্যেক প্রাণীকেই অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। সেই হিসাবে বলা যায়, জনসংখ্যা যত বেড়েছে, ততই মানুষ খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য জঙ্গল কেটে ঘর বানাচ্ছে এবং জীবিকা নির্বাহ করছে। আর বন্য জীবজন্তুর এলাকা ছোট হচ্ছে। ফলে তারা খাদ্যের জন্য হানা দিচ্ছে কাছের জনবসতিতে। এ ছাড়া আমপান, ইয়াসের পরে বাঁধ ভেঙে সমুদ্রের নোনা জল সুন্দরবন এলাকার মিষ্টি জলের পুকুরে মিশে যাওয়ায়, সেই জল বন্য জীবজন্তুর খাওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে তারা কাছের লোকালয়ে আসছে খাদ্য ও জলের সন্ধানে। এ ছাড়া জঙ্গল মাফিয়া, চোরাশিকারিদের উপদ্রবে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে। এ বিষয়ে স্থানীয় নেতা এবং প্রশাসনের একাংশের প্রচ্ছন্ন মদত সুস্পষ্ট।

ভারতের ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট, ২০০৬ বনাঞ্চলের বেশ কিছু এলাকায় স্থানীয়দের বসবাসের অধিকার দিয়েছে। আইনের অধিকারবলে যথেচ্ছ ভাবে জঙ্গল কাটার ফলে বনভূমি ছোট হচ্ছে এবং এর পরিণতিতে বাঘ জনবসতিতে ক্রমাগত হানা দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট ২০০৬ ফিরিয়ে নেওয়া-সহ আরও কঠিন আইন প্রণয়ন করতে হবে, যাতে বনভূমির মোট এলাকা সুরক্ষিত থাকে, বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত না হয় এবং বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীদের অস্তিত্ব সঙ্কটে না পড়ে।

সম্পাদক সমীপেষু: জলাভূমি দিবস

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন, জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য সরব হন। জলাভূমি বাঁচলে তবেই মানবসভ্যতা বাঁচবে।

১৯৭১ সালে ২ ফেব্রুয়ারিকে ‘বিশ্ব জলাভূমি দিবস’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এই দিনের কথা সাধারণ মানুষের মনে থাকে না। সরকারের তরফে তাঁদের বোঝানোর কোনও উদ্যোগও করা হয় না। আমরা, নাগরিকরা যখন ডেভলপার বা প্রোমোটারের কাছ থেকে ফ্ল্যাট বা আবাসন কিনি, তখন জানতে চাই না, জায়গাটা কি অতীতে জলাভূমি ছিল?

রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভূমি হল— স্যাঁতসেঁতে, পিটভূমি অথবা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট জলাশয় এলাকা, যা স্রোতস্বিনী অথবা স্রোতহীন, স্বাদু, লবণাক্ত বা মৃদু লবণাক্ত জলের দ্বারা পূর্ণ। সামুদ্রিক এলাকার সেই অংশকে জলাভূমি বলা হবে, যেখানে ভাটার সময় জলের উচ্চতা ৬ মিটারের নীচে থাকে। আবার অন্য ভাবে জলাভূমি বলতে বোঝানো হয়— এক পরিবর্তনশীল জলজ প্রতিবেশ, যেখানে জলস্তর ভূমির উপরিভাগে অবস্থান করে, অথবা সেই ভূখণ্ড অগভীর জল দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। আক্ষেপ এই যে, যদি এক শতাংশ মানুষও জলাভূমি রক্ষার্থে সচেতন থাকতেন, তা হলে লাগামছাড়া উন্নয়নে কিঞ্চিৎ লাগাম পরানো যেত।

বেঙ্গালুরু শহর এক সময় ঝিল-সরোবরের জন্য বিখ্যাত ছিল। ২০০টির উপর সরোবর ছিল সেখানে। মাত্র দু’-এক দশকের মধ্যেই এই শহরে সরোবরের সংখ্যা ৫০-এর নীচে চলে এসেছে, যার পরিণতিতে বর্ষায় শহর ডুবে যাচ্ছে। ২০১৮ সালের একটি তথ্য থেকে জানা যায়, পৃথিবীর ১৬৯টি দেশের প্রায় ২২৯০টি জলাভূমি চিহ্নিতকরণ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব কলকাতার ১২৫ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে যে বিশাল জলাভূমি আছে, এটি তার অন্তর্ভুক্ত। এখানে বছরে প্রায় ২০,০০০ টন মাছ এবং দৈনিক ১৫০ টন টাটকা আনাজ উৎপন্ন হয়। এর সংরক্ষণের জন্য যদি আজও আমরা উদ্যোগী না হই, তবে আর কবে হব?

দেখে নেওয়া যাক, অবহেলায় পড়ে থাকা জলাভূমিগুলো আমাদের কী কী কাজে লাগে— ১) জলাভূমি অসংখ্য জীবের চারণ ও প্রজননক্ষেত্র, ২) অনেক প্রাণীর জন্য জলাভূমি নিরাপদ বাসস্থান, ৩) জলাভূমির তলদেশের সবুজ উদ্ভিদ, গাছের পাতা এবং অন্যান্য অংশের পচনক্রিয়ায় উৎপন্ন বায়োমাস মৎস্য প্রজাতির আশ্রয় ও খাদ্য সংস্থান সুনিশ্চিত করে, ৪) জলাভূমির উপরিতল আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহ করে থাকে, ৬) মাটির বিভিন্ন স্তরে জল সরবরাহ করে, যাকে ‘ওয়াটার রিচার্জ’ বলা হয়। এ ছাড়াও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জল বিশুদ্ধিকরণ, স্থানীয় জলবায়ুর স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, কৃষিব্যবস্থায় সহযোগিতা-সহ নানা ভাবে উপকার করে জলাভূমি।তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন, জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য সরব হন। জলাভূমি বাঁচলে তবেই মানবসভ্যতা বাঁচবে।

WBCS Bengali Compulsory Paper.com